ISSN : 2278 - 1994

Ahana
Peer-reviewed Bilingual Yearly on Visual Art and Culture
Volume - VII | 2021
e-mail : editorahana@gmail.com
Web : www.ahanajournal.in

শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চা এবং সত্যজিতের প্রথম চলমান ছবি

দেবরাজ গোস্বামী
সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক আর্ট ডিপার্টমেন্ট, এম.এস. ইউনিভার্সিটি, বরোদা

ছবি- ১ (বাঁদিকে বেজ রামকিঙ্কর 'সামুদ্রিক দৃশ্য' ১৯৫১, ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টের সংগ্রহ থেকে, (ডানদিকে) রায় সত্যজিৎ, পথের পাঁচালী স্কেচ বুক, পৃ- ৫০, সম্পাদনা - রায় সন্দীপ, প্রকাশনা হারপার কলিন্স।

সংক্ষিপ্তসার : *নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে নব্য এবং প্রাসঙ্গিক আধুনিকতার শিল্পধারার চর্চা শুরু হয়েছিল তা কেবল চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। কলাভবনের ছাত্র হিসেবে সত্যজিৎ রায় যে শিল্পশিক্ষা পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রেও তার প্রতিফলন ঘটেছিলো। সত্যজিতের প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী তৈরির প্রাথমিক ভাবনা থেকে শুরু করে নির্মাণ প্রক্রিয়ার ওপরে রামকিঙ্করের কালিতুলির ড্রইং নন্দলাল বসুর সহজ পাঠের জন্যকরা লিনোকাটের ছবি, বিভিন্ন ড্রয়িং এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির নানা ধরনের অনুপ্রেরণা সচেতন এবং অবচেতনে কাজ করেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে পথের পাঁচালী ছবিটিকে শান্তিনিকেতনের শিল্পধারার চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তর বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।*

মূল শব্দমালা : *পথের পাঁচালী, শান্তিনিকেতন, প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা, সহজ পাঠ, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর, লিনোকাট, আম আঁটির ভেঁপু।*

১৯৪০ সালে স্বয়ং রবি ঠাকুর এবং মা সুপ্রভা রায়ের ইচ্ছেতেই শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়।[১] প্রাথমিকভাবে কলাভবনের ছাত্র হওয়ার ব্যাপারে সত্যজিৎ একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না, কারণ তাঁর ধারণা ছিল শান্তিনিকেতনে যে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয় সেটা বেঙ্গল স্কুলের পেলব ওয়াশ পেইন্টিং ধরনের কিছু একটা যা সম্পর্কে সত্যজিতের প্রবল অ্যালার্জি ছিল। পরে নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে এসে এবং বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর প্রমুখ শিল্পীদের কাজ দেখে তাঁর এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়। কেবল ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রকলাই নয়, ইজিপশিয়ান, আসিরিয়ান এবং দূরপ্রাচ্য যথা চীন ও জাপানের শিল্পকলার নানা দিক সম্পর্কে বিবিধ শিক্ষা সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সম্প্রতি ছাত্রজীবনে মাকে লেখা একটি চিঠি থেকে এও জানা যাচ্ছে যে অঙ্কনের ভুল ত্রুটি শোধন করে নেওয়ার জন্য নন্দলাল বসু সত্যজিতকে ইওরোপীয়ান ওল্ড মাস্টারদের ছবি কপি করবার পরামর্শও দিয়েছিলেন।[২] এটা সেই সময়ের কথা যখন একজন হলিউড ফিল্মের ভক্ত হিসেবে সত্যজিৎ প্রচুর ছবি দেখলেও ফিল্মমেকার হওয়ার কথা ভাবেননি বরং নিজেকে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে গড়ে তোলবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে সারা বিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাস সেই যে সত্যজিতের অবচেতনে পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয় তার প্রতিফলন পরিচালক হিসেবে তাঁর অনেক কাজের ভেতরেই একেবারে সরাসরি দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পথের পাঁচালী ছবিটি যে একটি মাইলফলক একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু চিত্রকলা

থেকে চলচ্চিত্রের রূপান্তরের প্রেক্ষিতেও এই ছবির গুরুত্ব অপরিসীম। শান্তিনিকেতনে শিল্পকলা সম্পর্কে যে গভীর বোধ তৈরি হয়েছিল সত্যজিতের শিল্পকলা সম্পর্কে যে গভীর বোধ তৈরি হয়েছিল সত্যজিতের মনে, তার অসামান্য ব্যবহার ছড়িয়ে রয়েছে এই ছবির বিভিন্ন ফ্রেমের মধ্যে। এখানে আমি সার্বিকভাবে চলচ্চিত্রের মধ্যে যে চিত্রকলার গুণ আছে তার কথা বলছি না। চিত্রকলার একেবারে সরাসরি রেফারেন্স বা অনুষঙ্গের কথা বলছি। পথের পাঁচালী ছবিটি করবার আগে একটি স্কেচ খাতার আটান্ন পাতা জুড়ে সত্যজিৎ এঁকে ফেলেছিলেন পথের পাঁচালী ছবির স্টোরি বোর্ড অথবা ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট। প্রাথমিকভাবে এটি ছবির প্রযোজককে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে নিয়ে আঁকা হলেও চিত্রকলার দিক থেকেও এর অসীম তাৎপর্য রয়েছে। যেহেতু এই ছবিগুলো কোন স্থির দৃশ্য বস্তুকে উপস্থাপন করবার জন্য আঁকা হয়নি বরং গতিশীল চলমান ছবি তৈরির প্রাথমিক খসড়া হিসেবে ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্টের মত করে তৈরি করা হয়েছে, ফলে এই ছবিগুলির অন্যতম প্রধান চরিত্র হচ্ছে 'গতি'। কালি তুলির গতিশীল ব্যবহার প্রতিটি ছবির মধ্যেই এমন এক চলমানতা যোগ করে দিয়েছে যে এই খাতার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে ছবি একবার দেখতে শুরু করলে আর থামা যায় না। একটি ছবির গতিশীলতা দর্শককে বাধ্য করে পরে পৃষ্ঠার ছবিতে চলে যেতে। কিন্তু ছবির মধ্যে এই অসম্ভব গতিশীলতা সত্যজিৎ যোগ করলেন কিভাবে? এর পিছনেও কি শান্তিনিকেতনের শিল্প শিক্ষার কোন ভূমিকা বা প্রভাব আছে? এর উত্তর পেতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে মহান শিল্পী রামকিঙ্করের কালি তুলি, জলরঙের ড্রইং এবং রেখাচিত্রগুলিতে।

রামকিঙ্করের কালি ও জলরঙের জলরঙের ছবিগুলি দূর প্রাচ্য, ইওরোপীয় এবং দেশজ বিভিন্ন শিল্পধারার এক আশ্চর্য সমন্বয় বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। একদিকে যেমন বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মাঝেমধ্যেই প্রতিচ্ছায়াবাদী বা উত্তরপ্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন ঠিক তেমনই আবার কালো কালির জোরালো এবং দ্রুত রেখার গতিময় প্রয়োগ ভীষণ রকমের দূর প্রাচ্যের চিনা ও জাপানী শিল্পকলার অনুসারী। আবার বিষয়বস্তু, বর্ণ চয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে দেশীয় এবং স্থানীয় ভাষ্য তা একান্তই রামকিঙ্করের ব্যক্তিগত যাপন ও চর্চার ফসল। কিন্তু এই তিনটি ভিন্নমুখী উপাদানের এক সার্থক সংশ্লেষ ঘটেছে রামকিঙ্করের ছবির মধ্যে। কলাভবনের ছাত্র হিসেবে রামকিঙ্করের ছবির এই দেশজ ভাষ্য এবং গতিময়তাকে সত্যজিৎ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া সত্যজিৎ যে বছর কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন, সেই বছরে কলাভবনে অতিথি শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিন দেশের শিল্পী সু বেইহং বা জ্যু পিয়ো। জ্যু পিয়োর ছবির একটি অন্যতম প্রধান চরিত্রই ছিল দ্রুতগতিতে ক্যালিগ্রাফিক তুলি ব্যবহার করে জোরালো কালির রেখায় চিত্র নির্মাণ করা। সে সময়ের কলাভবনের ছাত্র এবং সত্যজিতের সহপাঠী দিনকর কৌশিকের লেখা থেকে জানা যায় তৎকালীন শিল্প শিক্ষার্থীরা জ্যু পিয়োর এই ড্রইংয়ের পদ্ধতির দ্বারা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।[৩] সুতরাং পথের পাঁচালী ছবিটি তৈরি করবার আগে সত্যজিৎ যখন সে ছবির স্টোরি বোর্ড বা ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট তৈরি করবার কথা ভাবলেন, স্থির ছবির ভেতর দিয়ে চলমান ছবির পরিকল্পনা রূপায়নের কথা ভাবলেন, অবধারিত ভাবে তিনি বেছে নিলেন এমন এক গতিময় চিত্রভাষা যার উৎস রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, নন্দলাল হয়ে একেবারে চিনা শিল্পী জ্যু পিয়ো পর্যন্ত বিস্তৃত।

একটি বিশেষ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা পথের পাঁচালী ছবির ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট বা পথের পাঁচালী স্কেচ বুকের পঞ্চাশতম পৃষ্ঠায় একটি কালি তুলির ড্রইং আছে। এই ড্রইং-এর বিষয়বস্তু হল ইছামতী নদীর ওপরে গল্পের প্রধান চরিত্র অপু এবং তার বন্ধু পটুর ডিঙ্গি নৌকা চালানোর অ্যাডভেঞ্চার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মূল উপন্যাসটি পড়লে জানা যায় এই নৌকাবিহারের সময় আকাশ মেঘে কালো হয়ে ওঠে এবং ঝড় আসে। এই ঝড়ের কারণে হাওয়ার প্রবল গতিবেগ নদীর জলে যে প্রভাব বিস্তার করে এবং নৌকার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই গোটা বিষয়টি সত্যজিৎ তার ড্রইং- মধ্যে দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রবল জলস্রোতের ভেতর দিয়ে নৌকা বাওয়ার এমনই একটি জলরঙের ছবি এঁকেছিলেন রামকিঙ্কর। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আঁকা রামকিঙ্করের এই ছবিটি বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টের স্থায়ী সংগ্রহে রয়েছে। এই ছবিরও মূল বিষয়বস্তু ছিল গতি। এই গতিকে ধরে রাখতে একদিকে যেমন দ্রুত গতির বিপরীতমুখী তুলি চালনা করেছিলেন রামকিঙ্কর, ঠিক তেমনই ব্যবহার করেছিলেন জোরালো নিশ্চিত কালি তুলির রেখা। এই দুই উপাদানের সংশ্লেষে তিনি স্থির একটি ছবির মধ্যে আশ্চর্য এক গতিময়তার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যজিতের আঁকা পথের পাঁচালী স্কেচবুকের উল্লিখিত ছবিটির করণকৌশল এবং নির্মাণ নিশ্চিতভাবেই রামকিঙ্করের আঁকা ছবির অনুসারী। প্রায় একইরকম কৌশল প্রয়োগ করে সত্যজিৎ তাঁর ড্রইং-এর মধ্যেও সেই গতিময়তার সঞ্চার করেন।

পথের পাঁচালী উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করবার কথা সত্যজিৎ রায় প্রথম ভাবেন এই গল্পের শিশুপাঠ্য সংস্করণ

ছবি -২ আম আঁটির ভেঁপু, অলংকরণ - রায় সত্যজিৎ, পৃ-৩৯, প্রকাশনা সিগনেট প্রেস

'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির অলঙ্করণ করতে গিয়ে। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত এই বইটির জন্য অনেকগুলি কালি তুলির ড্রইংয়ে সাদা কালো ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন সত্যজিৎ। এই ছবিগুলি বাংলা মুদ্রণের জগতে অলংকরণ শিল্পের নিরিখেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে পর্যন্ত বাংলা মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে যে সমস্ত অলংকরণ শিল্পীরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা মোটামুটি পাশ্চাত্যের ইলাস্ট্রেশনের ধারাকেই অনুসরণ করে তারই ভারতীয় বা বঙ্গীকরণ করে ছবি আঁকার কাজটি সম্পন্ন করতেন। একমাত্র শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রকাশনার ক্ষেত্রে এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ঘটেছিলো। সেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে জগদানন্দ রায়ের লেখা বইয়ের অলংকরণ করবার জন্য ডাক পড়েছিল মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু থেকে ছাত্র বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের। এই প্রচেষ্টারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ হল নন্দলাল বসু কৃত সহজ পাঠ বইয়ের ছবিগুলি। সাদা কালো লিনোকাটকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সহজপাঠ (প্রথম ভাগ) বইয়ের অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল। যারা ছাপাই ছবির এই বিশেষ রিলিফ মাধ্যমটির সম্পর্কে অবগত আছেন তারা জানেন প্রাথমিকভাবে ব্লক নির্মাণের সময় সাদা এবং কালোর মধ্যবর্তী টোন হিসাবে নানা রকমের ধূসর বর্ণের ব্যবহার বা প্রয়োগ এই মাধ্যমে সম্ভব নয়। রিলিফ মাধ্যমে মধ্যবর্তী যে কোন রকমের টোন তৈরি করতে গেলে তা আদতে নির্মাণ করতে হয় সাদা ও কালোর নানা রকমের বিন্যাসের বুনট বা টেক্সচারের বিবিধ ব্যবহারের দ্বারা। নন্দলাল বসুর করা সহজ পাঠের লিনোকাটগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে সেই টেক্সচারের ব্যবহারেরও যথাসম্ভব কম শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবি বলেই হোক অথবা মুদ্রণ প্রক্রিয়ার গোলমাল হলে যাতে মূল ইমেজের কোন রকম বড় ধরনের ভ্রান্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় সেই কারণেই হোক, সহজপাঠের সাদাকালোর বিন্যাসকে যথাসম্ভব নিশ্চিত এবং জটিলতা মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন নন্দলাল। অনেক পরে আম আঁটির ভেঁপু বইটির সাদাকালো অলঙ্করণের কাজ করবার সময় খুব সচেতনভাবে সত্যজিৎ নন্দলালকৃত সহজপাঠের ধারাটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে সত্যজিতের মাধ্যম ছিল আলাদা। নন্দলাল যেখানে লিনোকাট ব্যবহার করেছিলেন সেখানে সত্যজিৎ কালো কালি এবং তুলির মাধ্যমে ছবিগুলি আঁকেন। কিন্তু সেই কালিতুলির ড্রয়িং-এর চরিত্র মাঝেমাঝেই লিনোকাটের ছাপাই ছবির কাছাকাছি চলে গেছে।

সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে অত্যন্ত যত্ন করে এমনভাবে সারফেসের সাদা রেখা বা বিন্দু ছেড়ে গেছেন যা দেখলে লিনোকাটের প্রিন্ট বলে বিভ্রম হয়। উদাহরণ হিসেবে একটি ছবির কথা বলা যেতে পারে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অপু এবং দুর্গা যখন একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেয় সেই দৃশ্যটি কালি তুলিতে এঁকেছেন সত্যজিৎ। কিন্তু গাছের গুঁড়ির গঠন বোঝাতে সাদা রেখার ব্যবহারই হোক অথবা কালো সারফেসের ওপর সাদা বৃষ্টির ফোঁটা, ড্রইং হলেও সমস্ত উপস্থাপনা একেবারেই লিনোকাটের ছাপাই ছবির অনুসারী (ছবি-২)। আম আঁটির ভেঁপু বইটির ইলাস্ট্রেশন এবং ভিস্যুয়ালাইজেশন পথের পাঁচালি উপন্যাসের সিনেমাটিক গুনাগুণ এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে সত্যজিতের কল্পনাকে প্রভাবিত করে যার ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে ইউরোপ থেকে ভারতে ফেরার পথে জাহাজে বসেই তিনি এই উপন্যাসটিকে নিয়ে ফিল্ম নির্মাণের খসড়া সম্পূর্ণ করে ফেলেন। [৪]

পথের পাঁচালি ফিল্মটি নির্মাণের সময়েও সাদাকালোর বিন্যাস এবং ক্যামেরার অবস্থান ও দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে সহজপাঠের লিনোকাটের প্রভাব অনেকটাই থেকে গিয়েছিল সত্যজিতের অবচেতনে। 'অবচেতনে' শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই

কারণেই যে মাধ্যমগত পরিবতন এবং সৃজনশীলতার যুক্তিতেই একজন প্রকৃত শিল্পী কখনই হুবহু অনুকরণের পথে হাঁটেন না। কিন্তু পূর্ববর্তীর কাছে তাঁর যে শিক্ষা, সেটা নিজের অবচেতনেই পরবর্তীর সৃজনশীলতার ওপরে একটা ছাপ রেখে যায়। ঠিক এমনটাই সত্যজিতের ক্ষেত্রে হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। পথের পাঁচালী ছবির অনেক দৃশ্য বা ফ্রেম দেখলেই মনে হয় সেগুলি যেন নন্দলাল বসুর লিনোকাট অথবা কালি তুলির ড্রইং-এর চলমান রূপ। যদিও সাদা কালো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ধূসর বর্ণের নানা ধরনের টোনের বিন্যাস এবং ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও কোথাও কোথাও সত্যজিৎ এই মধ্যবর্তী টোনগুলিকে সচেতন ভাবেই কমিয়ে এনে এমন একটি কন্ট্রাস্ট তৈরি করেছেন যা নন্দলালের সাদাকালো লিনোকাটের ছবিকেই মনে পড়িয়ে দেয়। এখানে দু'একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। পথের পাঁচালী ছবির একটি দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সন্ধ্যে নেমে আসছে। সন্ধ্যের আকাশে শেষ সূর্যের আলো এবং সেই আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে পুকুরের জলে। পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কতগুলি কলাগাছ। গাছগুলি নিরেট কালো, স্যিলুয়েট এবং সেই গাছেরও উল্টো প্রতিফলন পড়েছে পুকুরের জলে। কোন বাতাস নেই, তাই গাছগুলি প্রায় স্থিরচিত্রের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার নেমে আসার অপেক্ষায়। পথের পাঁচালী ছবির এই দৃশ্যটির পাশে যদি আমরা সহজপাঠের চ ছ জ ঝ অক্ষর চুতষ্টয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত নন্দলালকৃত লিনোকাটের ছবিটি তুলনা করে দেখি তাহলে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সচেতন অথবা অবচেতনে দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথম দৃশ্যকল্পটি নিশ্চিতভাবেই অনুপ্রাণিত। আর একটি উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে সন্ধ্যেবেলা প্রদীপের আলোয় বাবা হরিহরের পাশে বসে বালক অপুর লেখাপড়া করবার দৃশ্যটি। এখানেও আমরা দেখতে পাই ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে একদিক থেকে প্রদীপের আলো প্রতিফলিত হয় অপুর মুখাবয়বে। এই সাদাকালোর বিন্যাসের সঙ্গে একমনে লেখাপড়া করা বালক অপুর ভঙ্গিমা নিশ্চিতভাবেই আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় সহজপাঠের একটি লিনোকাটের ছবিকে। য র ল ব'সে ঘরে/ একমনে পড়া করে এই বহুপঠিত লাইন দুটির সঙ্গে নন্দলালকৃত যে ছবিটি দেখতে পাওয়া যায় পথের পাঁচালীর অপুর একমনে লেখাপড়া করবার দৃশ্যটির সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল (ছবি-৩) । এখানে আর একবার উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে যে এই মিল সত্যজিৎ সচেতনভাবেই গড়ে তুলেছিলেন না এটি তাঁর মনে থেকে যাওয়া শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষার পরোক্ষ প্রভাব সেটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু এইটা ভুলে গেলে চলবে না পথের পাঁচালী উপন্যাসটিকে ফিল্মে রূপান্তরিত করবার ধারণাটাই সত্যজিতের মাথায় প্রথম আসে ১৯৪৫ সালে 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির অলংকরণ করতে গিয়ে যেখানে তিনি সচেতনভাবেই তাঁর শিল্পগুরু নন্দলালের সাদা কালোর বিন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করেছিলেন।

ছবি-৩ (বাঁ দিকে) বসু নন্দলাল, সহজ পাঠ (প্রথম পাঠ), পৃ-৯ ও ১৭ লিনোকাট, ১৯৩০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
(ডানদিকে) রায় সত্যজিৎ, পথের পাঁচালী স্থির চিত্র, ১৯৫৫ (সৌজন্য ক্রাইটোরিয়ান কালেকশন)।

পথের রাঁচালী ছবিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কেবল সহজ পাঠের লিনোকাটের সাদাকালোর বিন্যাসকেই গ্রহণ করেছিলেন সত্যজিৎ এমনটা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কম্পোজিশন এবং চরিত্রায়নের ব্যাপারেও মাস্টারমশাই নন্দলালের ছাপাই ছবি এবং ড্রইংকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আজন্ম শহুরে পরিবেশে লালিত সত্যজিতের পক্ষে কেবলমাত্র বিভূতিভূষণের বর্ণনা পড়ে গ্রামবাংলাকে

ভিস্যুয়ালি কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রামীণ বাংলার জনজীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি সম্পর্কে কোন সরাসরি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগও তাঁর ঘটেনি। তিনি একদিকে যেমন এই গ্রাম বাংলাকে চিনেছিলেন বিভূতিভূষণের মত অসামান্য স্রষ্টার লেখনীর মধ্যে দিয়ে, ঠিক তেমনই তাঁর কল্পনায় যে দৃশ্যকল্প তৈরি হয়েছিল সেই বর্ণনা মিলে গিয়েছিল নন্দলাল, রামকিঙ্কর এবং বিনোদবিহারীর আঁকা ছবির সঙ্গে। ফলে বিভূতিভূষণের লেখাকে যখন তিনি চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করতে চাইলেন, যা আসলে হাজার হাজার স্থিরচিত্রের সামগ্রিক চলমান রূপ, সেখানে দৃশ্য কল্পনার ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণেই ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের এই মহান তিন শিল্পী। এই কারণেই কাশবনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ানো দুর্গাকে দেখলে মনে পড়ে যায় নন্দলাল বসুর কালিকলমের ড্রইং এর কথা, মাঠের মধ্য দিয়ে গরু নিয়ে দুর্গার ঘরে ফেরার দৃশ্য অবধারিতভাবেই মনে করিয়ে দেয় সহজ পাঠের " রেগে বলে দন্ত্য ন/ যাব না তো কক্ষনো" টেক্সটের সঙ্গে ব্যবহৃত নন্দলালের লিনোকাটের প্রসঙ্গ। আবার পথের পাঁচালী ছবির যে গ্রাম জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার নানা বর্ণনা সেখানে যেন সামগ্রিক ভাবেই উপস্থিত রয়েছেন শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বীরভূম ল্যান্ডস্কেপ' নামক মিউর‍্যালের মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে পথের পাঁচালী ছবির একেবারে শেষ দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ছবির জন্য যে ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট এঁকেছিলেন সত্যজিৎ (পথের পাঁচালী স্কেচ বুক) সেখানে ছবির শেষ দৃশ্যের উপস্থাপনা ছিল অন্যরকম। কিন্তু মূল ছবিটি করবার সময় দৃশ্যটি অন্যভাবে তোলেন সত্যজিৎ । সেখানে পিছন দিক থেকে একটি গরুর গাড়িকে চলে যেতে দেখা যায় এবং তার ছইয়ের মধ্যে ক্যামেরার দিকে মুখ করে বসে থাকা ছবিটির মূল তিনটি চরিত্র হরিহর, সর্বজয়া এবং অপু। নন্দলাল বসুর আঁকা একটি কালিতুলির ড্রয়িংয়ের সঙ্গে এই দৃশ্যটির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৫১ সালে বিজয়ার শুভেচ্ছাবার্তার সঙ্গে আঁকা ড্রইংটি নন্দলালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিল্লীর ললিত কলা একাডেমী প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়। এই ছবির বিষয়বস্তুও পিছন থেকে দেখা একটি গরুর গাড়ি যার ছইয়ের মধ্যে ঠিক একইভাবে বসে রয়েছে একটি পরিবার (ছবি-৪)।

ছবি-৪ (ওপরের সারি) বসু নন্দলাল ড্রইং ১ (শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬০, পৃ-৬৫), লিনোকাট ২ (সহজপাঠ প্রথম ভাগ, পৃ-১৪), ড্রইং ৩ (বসু নন্দলাল, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৮৩), ললিত কলা একাডেমী, চিত্র নং- ৫০। (নিচের সারি রায় সত্যজিৎ, পথের পাঁচালী স্থির চিত্র (৪, ৫ ও ৬), ১৯৫৫ (সৌজন্য ক্রাইটেরিয়ান কালেকশান)

পথের পাঁচালী ছবির আর একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা বলে এই আলোচনার ইতি টানতে চাই। সেটি হল মুষলধার বর্ষণের মধ্যে খোলা চুলে ঘুরে ঘুরে দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজা এবং এই দৃশ্যটি গাছের তলায় বসে দেখছে তার ভাই অপু। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই বিশেষ দৃশ্যটি একটি মাইল ফলক। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে আমি দৃশ্যটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখতে পাই। ১৯৩২ অথবা ১৯৩৩ সালে আঁকা এই ছবিটির বিষয়বস্তু হল খোলা চুলে ঘুরে ঘুরে নৃত্যরত একটি নারীমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যটি দেখেছেন এবং এঁকেছেন পিছন থেকে। কিন্তু কালিকলমের রেখার আঁচড়ে ছড়িয়ে পড়া খোলা চুল এবং শরীরের মোচড়ের মধ্যে দিয়ে স্থির ছবির ভেতরেও তিনি একধরনের চলমানতা এবং ঘূর্ণনের বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন, যে কারণে

ছবিটি দেখলেই মনে হয় মেয়েটি এক্ষুণি ঘুরে গিয়ে ছবির কম্পোজিশন পরিবর্তন করে দেবে। সত্যজিতের পথের পাঁচালী ছবিতে দুর্গার খোলা চুলে ঘুরে ঘুরে বৃষ্টিভেজার দৃশ্য দেখলে ভ্রম হয় রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিটিই যেন দুর্গায় রূপান্তরিত হয়ে ফিল্মের পর্দায় চলমান হয়ে উঠেছে। এই মিল সম্পূর্ণ কাকতালীয়, আমার কষ্টকল্পিত না সত্যজিতের সচেতন সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কোনরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে আমি অপারগ। কেবল এই দুটি দৃশ্যকে পাশাপাশি রেখে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গঠনের দায়িত্ব পাঠক এবং দর্শকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম (ছবি-৫)।

ছবি-৫ (বাঁ দিকে) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, নৃত্যরতা, ১৯৩২-৩৩, রবীন্দ্র চিত্রাবলী, তৃতীয় খণ্ড, চিত্র নং ২০২, প্রতিক্ষণ প্রকাশনী। (ডানদিকে) রায় সত্যজিৎ, পথের পাঁচালী স্থির চিত্র, ১৯৫৫ (সৌজন্য ক্রাইটোরিয়ান কালেকশন)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলার সঙ্গে ভারতীয় সমকালীন শিল্পের একটা আদানপ্রদান ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আদানপ্রদানের ফলে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা বলে যা গড়ে উঠেছিল তার একটা বড় অংশই ছিল আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলার দৃশ্যগত ভারতীয়করণ। এতে করে বাহ্যিক গঠনগত রূপায়নের ক্ষেত্রে একধরনের আধুনিকতার আভাস থাকলেও শিকড়ের সংযোগ তেমন টের পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে পিকাসো মাতিস অনুসারী এই চর্চা তার প্রসঙ্গ বা কনটেক্সটের সঙ্গে একীভূত হতে পারছিল না। এই একই সময় নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এক ভিন্ন ধারার শিল্পচর্চার সূত্রপাত হয়। ভারতীয় ধ্রুপদী এবং লোকশিল্প, দূরপ্রাচ্য, মিশর, তথা ইউরোপীয় শিল্পকলার নানাবিধ উপকরণের সঙ্গে স্থানীয় এবং সমকালীন অভিজ্ঞতার সার্থক সংশ্লেষ ঘটিয়ে ভারতীয় শিল্পধারায় নতুন প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা বা কনটেক্সচুয়াল মডার্ণইজমের সূচনা হয় শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের কাজের মধ্য দিয়ে। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কৃত মিউর‍্যাল বীরভূম ল্যান্ডস্কেপ, মিডিয়েভাল সেন্টস অথবা রামকিঙ্কর বেজ কৃত মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য সাঁওতাল পরিবার, কলের বাঁশি বা ধানঝাড়া এই প্রাসঙ্গিক আধুনিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু এই চর্চা কেবলমাত্র চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মধ্যেই সীমিত ছিল না। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল, বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্করের সান্নিধ্যে দৃশ্য নির্মাণ বিষয়ে যে ধারণা লাভ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, পরবর্তী কালে পথের পাঁচালী ছবিটি নির্মাণ করবার সময় সেই শিক্ষাকেই ব্যবহার করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক নতুন প্রাসঙ্গিক আধুনিক দৃশ্যভাষা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। সুতরাং পথের পাঁচালী এবং পরবর্তী সময়ে সত্যজিতের তৈরি আরও কিছু চলচ্চিত্রকে শান্তিনিকেতনের প্রাসঙ্গিক আধুনিকতারই চলমান চিত্রভাষায় রূপান্তর এবং প্রসারণ বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

তথ্যপঞ্জি :

১) অপুর পাঁচালী, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ-১৭
২) ঠাকুমাকে লেখা বাবার চিঠি, সন্দীপ রায় সম্পাদিত, শারদীয়া সন্দেশ, ১৪২৭, পৃ- ২৫৫
৩) মানিকের কথা, দিনকর কৌশিক, শান্তিনিকেতনের দিনগুলি, পত্রলেখা ২০০৯, পৃ - ৩৮
৪) অপুর পাঁচালী, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ-৪২